ইসলামী উগ্রপন্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভাগ্যে কি আছে?

তপন ঘোষ

ইসলামী উগ্রপন্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভাগ্যে কি আছে?

তপন ঘোষ

"......কোনো কোনো ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে চিন্তিত হবার কারণ আছে বইকী। হাজারিবাগে তো আমি বহুবার এসেছি ছেলেবেলা থেকে, কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা কখনও এত ছিল না। .....বুঝলি রুদ্র, ভারতবর্ষ আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাকিস্তান হয়ে গেলে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই, খুব অবাক হবার কিছু থাকবে না....দুরভিসন্ধি-সম্পন্ন ধান্দাবাজ মানুষেরা জেনেশুনে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে দেশটাকে। দিচ্ছে কি, দিয়েছে।"

—বুদ্ধদেব গুহ, ঋজুদার সঙ্গে রাজডেরোয়ায়।

প্রকাশক : তপন ঘোষ

প্রথম প্রকাশ : শুভ মহালয়া, ১৪১৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭

অক্ষর বিন্যাস :
দীপ কম্পিউটার সেন্টার
২৭, কানাই ধর লেন,
কলকাতা—৭০০ ০১২

মুদ্রণ :
ফাইভ স্টার প্রিন্টার্স
১১/এ, গড়পার রোড
কলকাতা—৭০০ ০০৯

মূল্য : ৫ টাকা

ইসলামী উগ্রপন্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভাগ্যে কী আছে?

আজকে, এবং শুধু আজকে নয়, গত প্রায় বছর বারো ধরে, দেশে এবং বিদেশে যে সমস্ত নাশকতামূলক এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপ ঘটছে তার অন্যতম প্রধান বলি ভারতীয় হিন্দু। এবং এই কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে সব ঘোষণা শোনা যাচ্ছে তাও হিন্দুনেতাদেরই মুখনিঃসৃত। কিন্তু সব হিন্দু এক নয়। বলিদান যাঁরা হচ্ছেন তাঁরা সাধারণ অরাজনৈতিক, নিরীহ মানুষ; আর ঘোষণা যাঁরা করছেন তাঁরা রাজনৈতিক, কিন্তু বেশিরভাগই নিজেদের হিন্দু বলতে লজ্জা পান—'সেকুলার' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলাটাই পছন্দ করেন। তাঁদের এইসব ঘোষণার মধ্যে দিয়ে তাঁদের 'ধর্মনিরপেক্ষতার' যে চেহারাটা পাওয়া যাচ্ছে তা কিছু লোককে ভাবাচ্ছে, বিচলিত করছে।

সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে পিছনদিকে যাই। পুনে-র জার্মান বেকারীর হত্যাকাণ্ড (যার বলি দুই বাঙালি ভাইবোন), তারও আগে মুম্বইয়ের ২৮/১১-র বীভৎসতা, তারও আগে মুম্বইয়ের ট্রেন বিস্ফোরণে যে এত সাধারণ মানুষ প্রাণ হারালেন, মায়ের কোল খালি হয়ে গেল, ছোট ছোট বাচ্চারা অনাথ হয়ে গেল, সেই বিস্ফোরণ কাদের কীর্তি? কাশ্মীরের উগ্রপন্থী হানায় কলকাতার দমদম পার্ক এলাকার যে সব নিরীহ ভ্রমণপিপাসু বাঙালির প্রাণ গেল সেই হানাই বা কাদের কীর্তি? কাশ্মীর থেকে সাড়ে তিন লক্ষ হিন্দুকে (যাদের সাধারণত 'পণ্ডিত' বলা হয়) নিজেদের গৃহ থেকে উৎখাত করে জম্মু ও দিল্লীতে তাদের পথের ভিখারীতে পরিণত করা কাদের কীর্তি? গোটা বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন, হিন্দু বিতাড়ন এবং সর্বোপরি হিন্দু মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার কাদের কীর্তি? উত্তর চব্বিশ পরগণার সীমান্তবর্তী অঞ্চল হিঙ্গলগঞ্জে কয়েকজন সাধারণ হিন্দু গৃহবধূর চেষ্টায় যারা ধরা পড়েছে তারা কারা? কলকাতায় ও নোয়াখালির ১৯৪৬ সালের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড কাদের কীর্তি? খবরের কাগজের অপরাধের খবরে কাদের নাম বেশি থাকে?

বিদেশের দিকে তাকাই : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টারে ৯/১১-র বিমানহানা, এবং তার ফলে দুই সহস্রাধিক নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু, কাদের কীর্তি? আফগানিস্তানে বামিয়ানের প্রাচীন, বিশাল ঐতিহ্যমণ্ডিত বুদ্ধমূর্তি কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া কাদের কীর্তি? ঢাকায় প্রাচীন রমনা কালীবাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া কাদের কীর্তি? রাশিয়ায় বেসলান শহরে ১৮৬ জন শিশুসহ ৩৩১ জনকে বাচ্চাদের স্কুলের

মধ্যে অবরোধ করে হত্যা করা কাদের কীর্তি? লণ্ডনের ৭/৭-এর পাতালরেলে হত্যাকাণ্ড কাদের কীর্তি? এই সমস্ত প্রশ্নের একটাই উত্তর। এইসব কীর্তি ইসলামী বা মুসলিম উগ্রপন্থীদের। এইসব উগ্রপন্থীর লক্ষ্য একটাই : পুরো জগৎকে ইসলামে দীক্ষিত করতে হবে, অন্য কোনো ধর্ম থাকা বা মানা চলবে না। একথা কেউ না মানলে তাকে হত্যা করা হবে, অন্যভাবে তার উপর অত্যাচার করা হবে। এইসব উগ্রপন্থীর প্রেরণার উৎস মুসলিম ধর্মশাস্ত্র কোরান ও হাদীসের উপদেশ। যেমন : "নিষিদ্ধ মাস অতীত হয়ে গেলে প্রতিমাপূজকদের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকবে, যেখানে তাদের পাবে সেখানে তাদের ঘিরে ফেলবে, বন্দী করবে, হত্যা করবে। কিন্তু যদি তারা ইসলাম মেনে নেয় এবং গরিবদের প্রতি দেয় অর্থ প্রদান করে তাহলে তাদের ছেড়ে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লা পরম দয়ালু এবং ক্ষমাশীল।" (কোরান, সুরা ৯, আয়াত ৫, তহরিকে তারসিলে কুরআন কৃত ইংরাজি অনুবাদ থেকে বাংলা অনুবাদ।) এরকম আরো অনেক আছে।

মুসলিম ধর্মশাস্ত্রের দুই প্রধান স্তম্ভের নাম কোরান এবং হাদীস। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী কোরান হচ্ছে ঈশ্বর বা আল্লার নিজের বাণী, যা তাঁর প্রেরিত পুরুষ হজরত মহম্মদের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছিল। আর হাদীস হচ্ছে হজরত মহম্মদের মুখনিঃসৃত বাণী, মহম্মদের জীবনযাত্রা এবং মহম্মদের সামনে তাঁর অনুচররা যা যা তাঁর সম্মতি নিয়ে করেছিল, তার বিবরণ। হাদীস লিখেছেন মহম্মদের বিভিন্ন অনুচরেরা, যাঁদের সম্মিলিত নাম 'সাহাবা'। এই সাহাবীদের মধ্যে নানা জন নানা হাদীস লিখেছেন, তার মধ্যে শাহী বুখারী, শাহী মুসলিম ও শামাইলে তিরমিজী অন্যতম। এইসব ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে তিন-চারটি বিষয় বা 'কনসেপ্ট' আছে যা অমুসলমানদের পক্ষে নিঃসন্দেহে বিপদের সূচক। এর মধ্যে প্রথম হল জিহাদ/জেহাদ, বা ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধ প্রতি মুসলমানের আজীবন অবশ্যকর্তব্য এবং এই যুদ্ধ হচ্ছে 'অবিশ্বাসী' (পড়ুন অ-মুসলমান) দের বিরুদ্ধে। কিছু লোক এই জেহাদের চেহারাটা নরম করার চেষ্টা করেন এই বলে, যে জেহাদের দুটি স্তর আছে—জেহাদ-আল্-আকবর (বৃহত্তর জেহাদ) এবং জেহাদ-আল্-আসগর (ক্ষুদ্রতর জেহাদ)। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে প্রতি মুসলিমের অন্তরের মধ্যে সু ও, কু-র লড়াই, এবং সু-র জয়ের মাধ্যমে 'আরো ভালো মুসলমান' হবার নিরন্তর প্রচেষ্টা। অপরপক্ষে ক্ষুদ্রতর জেহাদ হচ্ছে অমুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই। প্রথম কথা, জেহাদের এই সংজ্ঞা সুফী মতবাদের, মূলস্রোত ইসলামের নয় (টমাস প্যাট্রিক হিউজ কৃত 'এ ডিকশনারী অফ ইসলাম' দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়ত, এই সুফী মতবাদেও 'ক্ষুদ্রতর জেহাদ' হিসাবে অমুসলমান-বিধ্বংসী জেহাদ-কে স্বীকার করা হয়েছে। এখন, জেহাদ যদি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য হয় তাহলে সেই ধর্মপ্রাণ মুসলমান আমার সঙ্গে শান্তিতে সহাবস্থান করবে একথা কি করে মেনে নেওয়া সম্ভব?

আরো দুটি এরকম বিষয় বা 'কনসেপ্ট' হচ্ছে 'কাফের' এবং 'মুশরিক'। আরবী ভাষায় কুফর্ মানে বিরোধ করা, এবং কাফের হচ্ছে সেই লোক, যে ইসলামের বিরোধিতা করে। তেমনিই, আরবী ভাষায় 'শরিক' মানে অংশীদার (এই শব্দটি আরবী থেকে

বাংলাভাষাতেও ঢুকে গেছে, যেমন কোনো সম্পত্তির অংশীদারদের বলা হয় 'শরিক')। মুশরিক হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে মনে করে আল্লাই শুধু উপাস্য নন, তাঁর অংশীদার আছে, অর্থাৎ আল্লা ছাড়াও অন্য উপাস্য আছে। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, শুধু আল্লাকে উপাসনা করলেই চলবে না, অন্য কারুকে (যেমন মা কালী, মা দুর্গা, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রিস্ট, মা মেরী) ইত্যাদিদের উপাসনা করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। মুশরিক হবার যে পাপ তার নাম 'শিরক', এবং এই 'শিরক' যে করে সে বীভৎসতম নরকবাসে যেতে বাধ্য।

জেহাদ যে করে তাকে আরবীতে বলে 'মুজাহিদ'। এই মুজাহিদ যদি জেহাদে মৃত্যুবরণ করে তবে সে 'শহীদ' (এটিও বাংলা ভাষায় ঢুকে গেছে)। আর যে জেহাদে জয়ী হয় তাকে বলে 'গাজী'। এই দুটি স্থিতিই মুসলমানের কাছে পরমপ্রাপ্তি। এতবড় পরম প্রাপ্তি যে, জেহাদ করে শহীদ হতে বহু মুসলমান এককথায় রাজি—যেমন, ৯/১১-এর বিমানদস্যুরা, ভারতের সংসদ আক্রমণের ঘাতকবাহিনী।

সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই উগ্রপন্থী আছে, নিষ্ঠুর মানুষ আছে, আততায়ী আছে। তাদের সাথে মুসলিম উগ্রপন্থীদের প্রভেদ হচ্ছে, অন্য ধর্মের উগ্রপন্থীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে না, তাদের নিজেদের কুপ্রবৃত্তি দ্বারাই তারা চালিত হয়। আর মুসলমানদের মধ্যে বৃহৎ অংশ, যারা শান্তিপ্রিয়, উগ্রপন্থী নন, তারাও তাদের ধর্মগ্রন্থে যা লেখা আছে তা অস্বীকার করে না, করতে পারে না। এই অবস্থায় মুসলমানের সঙ্গে বাকি পৃথিবীর সহাবস্থানের যে সমস্যা জন্মেছে তা বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

আমরা অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের বা অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুরা তো প্রতিমাপূজক, একমাত্র ঈশ্বরেও তো আমরা বিশ্বাস করি না। দুর্গাপুজোর সময় মা দুর্গার প্রতিমা থেকে আরম্ভ করে মা কালী, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী, গোপাল ঠাকুর, গণেশ ঠাকুর, মা শীতলা, মা জগদ্ধাত্রী, মা মনসা, জগন্নাথ ঠাকুর ইত্যাদি সকলের প্রতিমার পুজো তো আমরা করি, শাঁখ বাজাই, কাঁসর ঘণ্টা বাজাই, পরস্পরকে আলিঙ্গন করি, গুরুজনদের প্রণাম করি, উৎসব উপলক্ষ্যে কটা দিন আহ্লাদে ভেসে যাই! তাহলে কি আমাদের জন্য মুসলমানের কর্তব্য ওৎ পেতে বসে থাকা এবং সুযোগ পেলেই আমাদের বন্দী করা বা হত্যা করা? করে 'গাজী', নিদেনপক্ষে 'শহীদ' হওয়া?

আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা তো তা বলে না। আমরা প্রচুর মুসলমানের সঙ্গে ওঠাবসা করি, এবং আচার ব্যবহারের দিক দিয়ে তাদের সাথে আমাদের কোনো প্রভেদই দেখা যায় না! তারাও আমাদের মতো হাসেন, কাঁদেন, ভালোবাসেন। তাঁদের উপাসনা পদ্ধতি ভিন্ন, তাঁরা প্রতিমাপূজা করেন না, নমাজ পড়েন—কিন্তু তাতে কী, তাঁরা তো আমাদের, দুর্গাপুজো, রথে নাক গলাচ্ছেন না, আমরাও তাদের নমাজ, ঈদ, মহরম, শবে বরাত-এ নাক গলাই না। আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, "যত মত তত পথ", ওঁদেরও নজরুলের কবিতা পড়ে আমরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হই, এস. ওয়াজেদ আলি রামায়ণ পড়া শুনে বলেছিলেন, "সেই tradition সমানে চলেছে," ওঁদেরও সৈয়দ মুজতবা আলি বিশ্বনাগরিক ছিলেন, ওঁদের রেজওয়ানা চৌধুরী, শামা রহমানের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে আমরা আবেগে আপ্লুত হই!

যদি তাই হয় তা হলে গণ্ডগোল কোথায়? কেন শুধু মুসলমান উগ্রপন্থীরাই এসব হত্যাকাণ্ডে মাতে? [এই প্রসঙ্গে গুজরাতের কথা উঠবে, সেজন্য গুজরাত সম্বন্ধে কিছু তথ্য এই পুস্তিকায় শেষে দেওয়া আছে।]

গণ্ডগোল দুই জায়গায়। প্রথম গণ্ডগোল, সব ধর্মের মানুষের উপর তাদের নিজ নিজ ধর্মের প্রভাব সমান নয়। সব ধর্ম কালক্রমে একভাবে থাকেও না, বদলায়। যেমন, একসময় হিন্দুধর্মে সতীদাহ, নরবলি, বহুবিবাহ ইত্যাদির মতো প্রথা ছিল, আজকে কোনো নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরও এই কথা বলতে কোনো দ্বিধা থাকে না যে এগুলি ঘৃণ্য, পৈশাচিক, পরিত্যাজ্য প্রথা। একসময় খ্রিস্টধর্মে অবিশ্বাসীদের একটা কাঠের সঙ্গে বেঁধে জ্যান্ত পোড়ানো হত, পোপ দশম লিও ঘুষ নিয়ে মানুষকে কুকর্ম করার অধিকার দিতেন, এসব জিনিস আজকে কোনো খ্রিস্টানই সমর্থন করবে না। ইহুদীরা যিশুখ্রিস্টকে ক্রুশে চড়িয়ে হত্যা করেছিল, সে সম্বন্ধে আজ ইহুদীরা অনুতপ্ত। অর্থাৎ এই সমস্ত ধর্মেরই কালক্রমে পরিবর্তন ঘটেছে, ধর্মের অসভ্য, মানববিরোধী প্রথাগুলো বাদ চলে গেছে। তাছাড়া এইসব ধর্মের কোনো শাস্ত্রেতেই বিধর্মীদের 'ঘিরে ফেলা', 'বন্দী করা' বা 'হত্যা করা'-র বিধান দেওয়া নেই। যদি কিছু থেকেও থাকে, এই সব ধর্মাবলম্বীরা তা মানেন না, এবং সেকথা প্রকাশ্যেই বলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, এইসব কথা কী ইসলাম এবং তার ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে বলা চলে? উত্তর, চলে না। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ এই নিয়ে গর্ব করেন যে গত চোদ্দশো বছরেও তাঁদের ধর্ম একচুল বদলায়নি। কোরান-হাদীসে যা লেখা আছে তা তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে মানেন। যাঁরা পুরোপুরি মানেন না তাঁদের নাম মুনাফেক, তাঁরা ঘৃণ্য। আর যাঁরা মানেন না তাঁদের সেকথা চুপিচুপি বলবার সাহসও নেই। এমনকি এস.ওয়াজেদ আলি, সৈয়দ মুজতবা আলি, কাজি নজরুল ইসলাম, কাজি আবদুল ওদুদ-এর মতো প্রাতঃস্মরণীয় মানুষরাও বলতে পারেননি (তসলিমা নাসরিনের মতো ব্যতিক্রম যাঁরা আছেন তাঁদের মাথার উপর ধর্মগুরুরা দাম ধার্য করে রেখেছেন)। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ অন্তত প্রকাশ্যে বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, প্রতি পুরুষের চারটি পর্যন্ত স্ত্রীকে বিবাহ করার অধিকার আছে এবং সেইসব স্ত্রীদের বিনাদোষে, একতরফা ভাবে, তালাক দেবার অধিকার আছে; প্রতিমাপূজকরা সবাই নরকে যাবে এবং সেখানে তাদের চামড়া আগুনে পুড়ে যাবে ইত্যাদি। তাঁরা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে "নারী পুরুষের শস্যক্ষেত্র, পুরুষ সেখানে যখন খুশি যেতে পারে" এবং কোনো স্ত্রী স্বামীর কথায় যৌনসঙ্গমে অসম্মত হলে স্বামীর অধিকার আছে সেই স্ত্রীকে পেটাবার। 'পর্দা'-র মতো প্রথা, যেখানে একজন মহিলাকে প্রচণ্ড ভাদুরে গরমেও মাথার উপর একটা কালো তাঁবু নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় সেই প্রথা বহু মুসলিম অনুচিত মনে করেন। কিন্তু কোনো মুসলিমের মুখে কখনো পর্দাপ্রথার নিন্দা শুনেছেন কি? কোনো মুসলিম ধর্মগুরুর মুখে 'যত মত তত পথ'—এরকম কথা কোথাও শুনেছেন কি? শোনেননি। একমাত্র এই-কথাই শুনেছেন যে ইসলামই একমাত্র সত্যপথ, অন্য পথ মিথ্যা পথ।

এইসব প্রথা কখনো কোনো অন্য ধর্মের সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ (তা সে নিজের ধর্মের মধ্যে যতই অত্যাচারিত হোক্) মানতে পারবে না। এবং সেজন্যই ইসলামী উগ্রপন্থীরা বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাস করে। হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নিম্নবর্ণের লোকেরা সামাজিক সাম্যের ধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিল, এটা ডাহা মিথ্যা কথা—উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে মানুষ ইসলামী অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই মুসলমান হয়েছিল। যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম বরণ করত তা হলে আজ হিন্দুসমাজে এত এস.সি. বা ও.বি.সি. থাকত না, আটশো বছরের ইসলামী শাসনের পরে ভারতের বেশির ভাগ মানুষও হিন্দু থাকত না।

ইসলামের এই জবরদস্তি, গায়ের জোরে ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা, কালের প্রয়োজনেও কোনো পরিবর্তন মেনে নিতে রাজি না থাকা, এবং অন্য ধর্মের ও অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সহিষ্ণুতা, এখানেই প্রথম গণ্ডগোল।

দ্বিতীয় গণ্ডগোল ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ বা মুসলমানদের নিয়ে নয়, অন্য ধর্মের কিছু মানুষকে নিয়েই। এঁদের জীবনের ব্রত হচ্ছে ইসলামের বা মুসলমানের কুকীর্তি চাপা দেওয়া। এরকম লোক পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, এদের সাধারণভাবে apologist বা সাফাই-প্রদানকারী বলা হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে এরা সংখ্যায় প্রচুর এবং এখানে এদের নাম হচ্ছে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বা 'Secular'। ইসলামে বিশ্বাসী উগ্রপন্থীরা অন্য ধর্মের মানুষের যতটা না ক্ষতি করে, এইসব সাফাইকারী বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে, কারণ এদের কথায় উগ্রপন্থীদের কুকীর্তি মর্যাদা পেয়ে যায়।

এই ব্যাপারটা বুঝতে হলে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে ধরনের নাশকতামূলক কাজ চলছে তার উত্তরে সেইসব দেশের রাষ্ট্রনায়কদের উক্তিগুলো বিবেচনা করুন।

"এই দুর্ঘটনার মাত্র তিনদিন পরে আমরা মার্কিনরা হয়ত ব্যাপারটাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ইতিহাসের কাছে আমাদের কর্তব্য স্পষ্ট : এই আক্রমণের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে হবে এবং পৃথিবী থেকে এই অভিশাপ তাড়াতে হবে। আমাদের উপর চুরি, প্রতারণা ও খুনের মাধ্যমে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই দেশ শান্তিপ্রিয়, কিন্তু ক্রুদ্ধ হলে ভয়ানক। এই যুদ্ধ, অপরপক্ষে নিজেদের সুবিধামত সময়ে, নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী শুরু করেছে। এই যুদ্ধ শেষ হবে আমাদের সুবিধামত সময়ে, আমাদের সুবিধামত উপায়ে।"

[মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু. বুশ, ৯/১১-কে ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টারের উপর আক্রমণ প্রসঙ্গে, ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০১]

"আজকে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের দেশ থেকে বিতাড়নের জন্য নূতন নিয়ম চালু করবেন......কেউ যেন সন্দেহ না রাখেন যে খেলার সমস্ত নিয়ম বদলে যাচ্ছে......আগামী শরৎকালেই নূতন উগ্রপন্থা-বিরোধী আইন পাশ করা হবে। সেই আইন অনুযায়ী উগ্রপন্থাকে ক্ষমা করা বা প্রশংসা করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ধার্য করা হবে।.....শুধু এই দেশের মধ্যে উগ্রপন্থা নয়, পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় উগ্রপন্থাকে ক্ষমা করা বা প্রশংসা

করাকেই অপরাধ ধার্য করা হবে।.......প্রয়োজনমত বিচারকদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হবে ....আমরা বিচার- বিবেচনা করব একটি নূতন বিষয়ে : কোনো উপাসনাস্থল যদি উগ্রপন্থা প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হয় তবে সেই উপাসনাস্থল বন্ধ করে দেওয়া যায় কিনা।.......ব্রিটেনে থাকতে হলে ব্রিটিশ জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে থাকতে হবে।"

[ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ার, ৪ জুলাই, ২০০৫ তারিখে লন্ডনের পাতাল রেলে বিস্ফোরণের পরে, ৫ আগস্ট ২০০৫।]

"........আমরা একটা ঘুম থেকে জেগে ওঠার ডাক (Wakc-up call) পেয়েছি, সেটা এসেছে সোজা নরক থেকে। এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন খুব সরল : আমরা কি সময় থাকতে এই শয়তানিকে মোকাবিলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হব, না কি আবার ঘুমিয়ে পড়ব এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যাব? কোনো পদক্ষেপ নিতে হলে এখনি নিতে হবে। আজকে এই উগ্রপন্থীরা আমাদের ধ্বংস করতে চায়, কিন্তু তাদের সে ক্ষমতা নেই। আমাদের কিন্তু নিঃসন্দেহে ক্ষমতা আছে ওদের ধ্বংস করবার। আমাদের এবার দেখিয়ে দিতে হবে, যে এই ধ্বংস করার ইচ্ছাশক্তিও আমাদের রয়েছে।"

[ইজরায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানইয়াহু, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০১, ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টারের উপর ৯/১১-র আক্রমণ প্রসঙ্গে।]

রুশিয়ার ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস চেচেন উগ্রপন্থী শামিল বাশয়েভ এবং আসলান মাশখাদভকে 'নিবীর্য' করার খবরের জন্য ৩০ কোটি রুবল (১.০৩ কোটি মার্কিন ডলার) পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

"উগ্রপন্থা প্রতিরোধের ব্যাপারে আমরা পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় উগ্রপন্থী ঘাঁটি ধ্বংস করার ব্যবস্থা করব।"

[জেনারেল যুরি বালুয়েভস্কি, রুশ সেনাবাহিনীর প্রধান, রুশিয়ার বেসলান শহরে ১৮৬ জন শিশুসহ ৩৩১ জনকে উগ্রপন্থী কর্তৃক হত্যা প্রসঙ্গে।]

এবার আমাদের ভারতীয় 'সেকুলার' রাষ্ট্রনায়কদের উক্তিগুলি পড়ুন।

"যাঁরা এই বিস্ফোরণে আঘাত পেয়েছেন বা প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য আমার প্রাণ কাঁদছে! আমাদের শান্তিপ্রিয় মানুষের বিরুদ্ধে এই লজ্জাজনক ঘটনাগুলির আমি তীব্র নিন্দা করি!"

[জুলাই ২০০৬-এ মুম্বইয়ের ট্রেন বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং]

"জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ অতীতে সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে উগ্রপন্থী হানার মোকাবিলা করেছেন। ওঁরা এখনো তা করতে থাকবেন এবিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত।"

[প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কাশ্মীরে বাঙালি পর্যটকদের উপর গ্রেনেড বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে।]

"নয়াদিল্লী, জুলাই ২৫ : 'পোটা' আইন আবার চালু করার প্রস্তাব সরকার প্রত্যাখ্যান করল। লোকসভায় বিজেপি এবং অন্যান্য এন.ডি.এ শরিকদের আনা মুম্বই বিস্ফোরণের ব্যাপারে মুলতুবি প্রস্তাব ধ্বনিভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গেল। বিজেপি এবং এন.ডি.এ-র শরিকরা এর প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করেন।

আলোচনা চলাকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল বিরোধীপক্ষের নেতা এল. কে. আদবানির আনা দাবী খারিজ করে দেন। দাবীতে ছিল, উগ্রপন্থাবিরোধী আইন 'পোটা'কে আবার চালু করতে হবে, যাতে যথাযথভাবে উগ্রপন্থার মোকাবিলা করা যায়। যদিও শ্রীপাটিল সভাকে জানিয়েছেন যে তিনি কোনোভাবেই উগ্রপন্থার প্রতি নরম হচ্ছেন না।"

"মাদ্রাসা কোনো উগ্রপন্থা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নয়। মাদ্রাসাগুলি সামাজিক উন্নতিবিধানের এক একটি কেন্দ্র"—শিবরাজ পাটিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

"সিমি' কোনো উগ্রপন্থী প্রতিষ্ঠান নয়, এর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত।"—মুলায়ম সিং যাদব, মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ।

"নয়াদিল্লী, জুলাই ১৬ : মানবসম্পদ মন্ত্রী অর্জুন সিং এবং সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী আবদুর রহমান আনতুলে বলেছেন, সরকারের সাবধান হওয়া উচিত, যাতে মুম্বই বিস্ফোরণের ব্যাপারে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত না করা হয়।"

"যায় কেন ওখানে?"

[কাশ্মীরে বাঙালী পর্যটকের উপর গ্রেনেড আক্রমণ প্রসঙ্গে জ্যোতি বসু। ইঙ্গিত : দ্যাখ না, আমি কেমন বছর-বছর বৌ-ছেলে বগলে করে বিলেত-আমেরিকা বেড়াতে যেতাম, আর বলতাম অনাবাসী শিল্পপতি ধরে আনতে যাচ্ছি! তোরা পারিস না এরকম?]

যেখানে অন্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সন্ত্রাস ও নাশকতার বিরুদ্ধে এইরকম দৃপ্ত ঘোষণা, সেখানে আমাদের ভারতীয় নায়কদের প্রতিক্রিয়া কী? না, কিছু ম্যাদামারা উক্তি, কিছু অর্থহীন বহুচর্চিত, বহুচর্বিত তত্ত্ব এবং কিছু নির্লজ্জ মুসলমান তোষণের প্রয়াস। একটিবার কেউ বললেন না, আমরা অপরাধীদের নির্মমভাবে মোকাবিলা করব, কেউ বললেন না, তাদের উচিত শাস্তি দেব। শ্যামাপ্রসাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কথা বলেছিলেন, সেই 'প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রতিশোধ'-এর কোনো কথা নেই। শুধু নাকে কাঁদা, শুধু দুঃখপ্রকাশ, শুধু ক্লীবতা। এই চিঁ চিঁ সুর ভারতীয় 'সেকুলার' নায়কদের জন্মগত। সম্ভবত নিজের সন্তানঘাতক (ঈশ্বর না করুন) যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হয় তাহলেও বোধ হয় তাঁরা এর চেয়ে জোরে কিছু বলতে পারবেন না। আমাদের নিকটতম আত্মীয় যে বাংলাদেশী হিন্দুরা, যে দেশ থেকে আমরা অনেকেই (জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ইত্যাদি 'সেকুলার' নেতা সমেত), শুধু হিন্দু হবার অপরাধে চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে বিতাড়িত হয়ে এসেছি, সে দেশের হিন্দুহত্যা ও হিন্দুনারীধর্ষণ সম্বন্ধে এরা মূক। কেউ কেউ আবার (কমিউনিস্টরা খুব চালাক তো!) রাজনৈতিক সাফাই মারেন, যেমন বিমান বসু মেরেছিলেন, "কে বলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যাচার হচ্ছে? হ্যাঁ, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলে শুনেছি, তার মধ্যে হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে।" বাহবা বিমানবাবুর মিথ্যাভাষণ! এঁর আরো এই ধরনের কীর্তি আছে। মুম্বইয়ে ট্রেন বিস্ফোরণের পর ইনি বলেছিলেন, এই বিস্ফোরণ নাকি শিবসেনা করিয়েছে! যখন সারা ভারতের বাঘা বাঘা সরকারি গোয়েন্দারা এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে এই বিস্ফোরণ ইসলামী উগ্রপন্থীদের

কীর্তি, তখন বিমানবাবু তাঁর 'এসপেসাল' বেসরকারী গোয়েন্দাদের মাধ্যমে উল্টো খবর পেয়ে গেলেন! বিমানবাবুর এই উক্তি শুনে সাধারণ মানুষ তো বটেই, কমরেড ঘোড়ারাও হেসেছিল। এখানেই শেষ নয়। এই ব্যাপারটা থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেবার জন্য একটা মিছিল বার করলেন, লেবাননে ইজরায়েলী বাহিনীর অভিযানের বিরুদ্ধে। কিন্তু চেপে গেলেন, কেন লেবাননে ইজরায়েলীরা অভিযান করেছে। করেছে তার কারণ, দক্ষিণ লেবাননে স্থিত 'হেজবোল্লা' নামক শিয়া মুসলমান উগ্রপন্থীরা ক্রমাগত ইজরায়েলে অভিযান চালিয়েছে, আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে, বহু ইজরায়েলীকে খুন করেছে। তাদের মুরুব্বি ইরান ইজরায়েলকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেবে বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু ইজরায়েলীরা ভারতীয় 'সেকুলার' রাজনীতিকদের মতো নপুংসক নয়, তারা বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে না, যেখান থেকে আঘাত এসেছে সেখানে সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত করে। খবর হচ্ছে, দক্ষিণ লেবাননে এই হানার ফলে শয়তান হেজবোল্লাদের ঘাঁটি চূর্ণ হয়ে গেছে, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।

সেকুলার নেতাদের আর একটি কীর্তি হচ্ছে 'টাডা' বা 'পোটা' আইন বাতিল করা। TADA হচ্ছে "Terrorist and Disruptive Activities Act", এটি একটি উগ্রপন্থা-বিরোধী আইন, কংগ্রেসী আমলেই করা হয়েছিল, পরে বাতিল করা হয়। POTA হচ্ছে "Prevention of Terrorist Activities Act", টাডা বাতিল হবার পর এন. ডি. এ. সরকার ক্ষমতায় এসে এই আইন চালু করে। এই আইনগুলির উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমান সাধারণ অপরাধ-বিরোধী আইনের ফাঁক দিয়ে উগ্রপন্থীরা বেরিয়ে না যেতে পারে তা নিশ্চিত করা। সাধারণ অপরাধ-বিরোধী আইন মানে মূলত তিনটি আইন, অর্থাৎ : Indian Penal Code 1860 (১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধি), Criminal Procedure Code 1963 (১৯৬৩ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি) এবং Indian Evidence Act 1872 (১৮৭২ সালের সাক্ষ্যপ্রমাণ আইন)। আইনগুলির সাল দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এগুলি যখন প্রণয়ন করা হয়েছিল তখন উগ্রপন্থা বলে কিছু ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই, এই আইনগুলির ফাঁক দিয়ে উগ্রপন্থীরা বেরিয়ে যাচ্ছিল, বা এই আইনগুলি প্রয়োগ করে উগ্রপন্থীদের ঠিক ঠিক ধরা যাচ্ছিল না, সেজন্য টাডা বা পোটা-র প্রয়োজন হয়। অথচ এই টাডা-পোটা পরে বাতিল করা হয়। কেন?

কারণটা শুনে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মানুষের চোখ কপালে উঠবে। কারণ হচ্ছে—এইসব আইনে নাকি বেশি বেশি মুসলমান ধরা পড়ছিল! যেখানে উগ্রপন্থীরা সবাই মুসলমান, যেখানে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই উগ্রপন্থার প্রেরণা পাচ্ছে, সেখানে মুসলমান ধরা পড়বে না তো কি বৌদ্ধ বা জৈনরা ধরা পড়বে? অথচ এইসব আইনের বিরুদ্ধে ভারত জুড়ে শাহী ইমামের মতো 'ধর্মনিরপেক্ষ', আর মুলায়ম সিং যাদবের মতো 'পরম সেকুলার' সোচ্চার হলেন এবং এইসব আইন বাতিল হল। অথচ টোনি ব্লেয়ারের বক্তব্য দেখুন—উনি উগ্রপন্থা দমনের জন্য ব্রিটেনে নূতন আইনের প্রস্তাব করছেন! একটা দেশের নেতৃত্ব

কতদূর দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে, মুসলমান ভোটের লোভে এই তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' বা 'সেকুলার' শ্রেণি কত নিচে নামতে পারে, রাজনৈতিক ন্যাকামি কতদূর সীমা ছাড়াতে পারে, তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ এই টাডা বা পোটা বাতিল।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। একটা বাড়িতে ডাকাতি হল, খুনও হল, ডাকাতরা পালাবার সময় আবছা অন্ধকারে একজন দেখতে পেলেন ছ-সাতজন ডাকাত ছিল, তারা সবাই লম্বা, কালো এবং তার মধ্যে দু-একজনের দাড়ি আছে। তাহলে কি ওই অঞ্চলের সমস্ত লম্বা, কালো এবং দাড়িওয়ালা লোকের উপর সন্দেহ করা, তাদের গতিবিধি অনুসন্ধান করা অনুচিত হবে? অবশ্যই না, তা করাই স্বাভাবিক হবে। তার মানে এই নয় যে লম্বা কালো এবং দাড়িওয়ালা হওয়াটা কোনো অপরাধ—কিন্তু পুলিশের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটা তো ছোট করে আনতে হবেই! আচ্ছা, এবার বলুন তো, পৃথিবীতে এত উগ্রপন্থী মুসলমান হওয়ার পরে, কোন উগ্রপন্থী ঘটনা ঘটলে মুসলমানদের সন্দেহ করা কি অনুচিত হবে? তার মানে এই নয় যে মুসলমান হওয়া একটা দোষ! তার মানে শুধু অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটাকে ছোট করে আনা। এইজন্যই টাডা-পোটা আইনে বেশি করে মুসলমান ধরা পড়বে, এটাই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আমাদের সেকুলার নেতারা এমন বলেন। এবং এই তথাকথিত 'সেকুলার'বাদের শেষ পরিণতি কী?

প্রথম প্রশ্নটার উত্তর খুব সোজা। কিন্তু সোজা উত্তরের সঙ্গে অন্তর্নিহিত যে বিষয় আছে সেটাও বুঝতে হবে। এই ধরনের উক্তি আমাদের 'সেকুলার' নেতারা করেন মুসলমানের ভোট পাবার জন্য। এইসব 'সেকুলার' নীতির ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অনেক কম ঘটেছে। অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে ধর্মান্ধ হওয়া সহজ এবং এমনিতেই মুসলমানের মধ্যে ধর্মের বাঁধন অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি কড়া, এ বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। এই দুয়ের ফলে সাধারণ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী ধর্মগুরু, অর্থাৎ মসজিদের ইমামের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। মুসলমানদের প্রথা হচ্ছে, শুক্রবারের নমাজের পরে ইমাম কিছু জাগতিক বিষয়ে পরামর্শ দেন, তাকে বলে 'খুৎবা'। এই খুৎবা যাতে তাদের বা তাদের দলের পক্ষে যায় সেজন্য 'সেকুলার' রাজনীতিকরা নিজের ইজ্জত বেচে দিতে পারে, সম্ভবত নিজের মা-বোনেদেরও বেচে দিতে পারে। সেজন্যই মাঝে মাঝে দেখা যায়, 'সেকুলার' রাজনীতিকরা কোনো না কোনো মসজিদের ইমামকে (নিজের মর্যাদা অনুযায়ী) জাপ্টে ধরে ছবি তোলাচ্ছেন।

এই বিকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আর একটি প্রকাশ নির্লজ্জ দ্বিচারিতা। আরো একটি প্রকাশ, ইতিহাস লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা। আরো একটি প্রকাশ এক বিচিত্র অপ-সাংবাদিকতা। এই তিনটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে।

মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে একটি বিধি ছিল, "The king can do no wrong", রাজা কখনো কোনো অন্যায় করতে পারেন না। আর আজকে আমরা এই তথাকথিত সেকুলারদের কাজে এবং কথায় দেখছি, "এ মুসলিম ক্যান ডু নো রঙ্", একজন মুসলমান কোনো

অন্যায় করতে পারে না। তাই যখন মুসলমান অন্যায় করে তখন এই 'সেকুলার' গোষ্ঠীরা ঝটিতি মাঠে নেমে পড়েন। সাধারণত এরা তিন রকম কুকীর্তির মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি করার চেষ্টা করেন। এক, অখণ্ড নীরবতা। দুই, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা, অর্থাৎ অন্য কারুর কুকীর্তিকে বড় করে দেখিয়ে মুসলমানের কুকীর্তি চাপা দেওয়া। আর তিন, নির্জলা মিথ্যা কথা বলা।

উদাহরণ, রয়েছে ভূরি ভূরি। কাশ্মীরে সাড়ে তিন লক্ষ হিন্দু 'পণ্ডিত' সম্প্রদায়ের মানুষকে, শুধু হিন্দু হবার অপরাধে পথের ভিখারি করে দেওয়া—'সেকুলার' প্রতিক্রিয়া, নিশ্ছিদ্র নীরবতা। তালিবান আমলে আফগানিস্তানে মেয়েদের একটা পশুর অধম স্তরে নিয়ে যাওয়া, কোনো পেশা বন্ধ করে দেওয়া—নিশ্ছিদ্র নীরবতা। ওই আমলেই বামিয়ানের জগদ্বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া—নিশ্ছিদ্র নীরবতা। ইরাকী একনায়ক সাদ্দাম হুসেনের আমলের কুর্দ বিদ্রোহীদের উপর বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ—নিশ্ছিদ্র নীরবতা।

এবার শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। লেবানন, সিরিয়া, হামাস, ইন্তিফাদা ইত্যাদি আরব দেশ ও গোষ্ঠী ক্রমাগত ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নাশকতা করে যাচ্ছে। কিন্তু যেই ইজরায়েল তার প্রত্যুত্তর দেবে তখনই হাঁ হাঁ করে সেকুলার গোষ্ঠী চিৎকার করে উঠবে। যেন ইজরায়েলের অধিকার নেই তাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখার। ইরানের সাদ্দাম হোসেন এত বড় নরপশু ছিল যে নিজের জামাইকে শুধু সন্দেহের বশে নিজের হাতে খুন করেছিল, নিজের মন্ত্রিসভার সদস্যদের শুধু প্রতিবাদ করার দোষে খুন করেছিল, কুর্দ উপজাতীয় বিদ্রোহীদের উপর বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করেছিল। অকারণে, শুধু তেলের অধিকার পাবার জন্য, কুয়েতের ওপর অভিযান করেছিল। সাদ্দামের দুই ছেলে উদে এবং কুশে, বাগদাদের রাস্তায় কোনো সুন্দরী মেয়ে পছন্দ হলে, তাকে তুলে নিত, ছিবড়ে করে ফেলে দিয়ে যেত। আমেরিকা ইরাক অভিযান সম্পূর্ণ ভুল কারণে করেছে, কিন্তু তাতে তো সাদ্দামের দোষ কমে না! তাহলে বিমান বসু অ্যাণ্ড কোম্পানী যখন রাস্তায় নেমে আমেরিকার বা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গলায় রগ ফুলিয়ে চীৎকার করে তখন হামাস, তালিবান বা সাদ্দামের দোষের কথা বলে না কেন? কারণ একটাই : হামাস বা সাদ্দাম মুসলমান, এবং মুসলমানের ভোটের জন্য এরা সবরকম মিথ্যাকথা বলতে রাজি।

এই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যাপারে ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার সংবাদমাধ্যম একটা ন্যক্কারজনক নোংরা ভূমিকা পালন করেছে। যেমন : কাশ্মীরে ইসলামী উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপের ফলে যে সাড়ে তিন লক্ষ 'পণ্ডিত' পথের ভিখারী হয়েছে সে সম্বন্ধে যে সংবাদমাধ্যম চুপচাপ সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই উগ্রপন্থীদের ধরার জন্য যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা ভারতের তরফ থেকে করা হচ্ছে সে সম্বন্ধেও কি চুপচাপ? আজ্ঞে না। সেখানে কোথায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীরা উগ্রপন্থীদের সন্ধানে কাশ্মীরী মুসলমান গ্রামে ঢুকে কয়েকজন যুবককে কলার ধরে একটু ঝাঁকাঝাঁকি করল, তার প্রতিবাদে আমাদের 'সেকুলার' সংবাদমাধ্যম উত্তাল! সে কি নাকে কাঁদুনি, সে কি চোখের জলের বন্যা বইয়ে দেওয়া! লন্ডনে ৭/৭-এর পাতাল রেলে বোমা বিস্ফোরণের পরে একটি ব্রেজিলীয় যুবক

একটি বেড়া টপকাচ্ছিল, তার নাকি বেজায় তাড়া ছিল। সে পুলিশের কথা শোনেনি, ফলে পুলিশ তাকে পিছন থেকে গুলি করে মেরেছে—এর সহানুভূতিতে 'সেকুলার' সংবাদমাধ্যম গলে জল। কিন্তু ইসলামী উগ্রপন্থীদের নিন্দা, বা যে সব হতভাগ্য তাদের কীর্তিকলাপের ফলে মারা গেল তাদের সম্বন্ধে কিছু? ঠিকই ধরেছেন। নিশ্ছিদ্র নীরবতা।

কেন এইসব শয়তান 'সেকুলার' মেকি ধর্মনিরপেক্ষরা বলতে পারে না, যে অন্যপক্ষ অন্যায় করলেও যতটা অন্যায়, মুসলমান অন্যায় করলেও ততটাই অন্যায়? কেন বলতে পারে না, ইজরায়েলের দোষ থাকলে ইন্তিফাদা, হামাসেরও দোষ, আমেরিকার দোষ হলে সাদ্দাম, তালিবানদেরও সমান দোষ? কেন বলতে পারে না, হিন্দুদের সতীদাহ, নরবলি, অস্পৃশ্যতা যতটা অন্যায়, মুসলমানের বহুবিবাহ, পর্দাপ্রথা, তিন তালাক, ব্যভিচারের দোষে পাথর ছুঁড়ে হত্যা, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ, ঠিক ততটাই অন্যায়? এই সমস্ত কুপ্রথা মুসলমান দেশ তুরস্কের জননেতা কামাল আতাতুর্ক আজ থেকে আশি বছর আগে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আমরা কেন বন্ধ করছি না, তার সমালোচনা কেন 'সেকুলার'-রা বা তাদের পেটোয়া সংবাদমাধ্যম করতে পারে না? যে জোর নিয়ে, যে রকম গলার রগ ফুলিয়ে মাসের পর মাস ধরে গুজরাতের দাঙ্গার নিন্দা করেছে, পথে নেমে তামাসা, খেউড়, নওটঙ্কি করেছে এইসব 'সেকুলার', 'ধর্মনিরপেক্ষ', দুর্বুদ্ধিজীবি, তার একফোঁটাও কেন শোনা যায় না বাংলাদেশের ভোলা জেলার ২০০১ সালের হিন্দুমেধ যজ্ঞে, যাতে বলা হয়ে থাকে, ভোলা নামক দ্বীপ-জেলাতে সাত থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কোনো হিন্দু মেয়ে ছিল না যে ধর্ষিতা হয়নি। যেখানে মেয়ের মাকে বলতে হত, বাবারা, মেয়েটা আমার খুবই ছোট, তোমরা একজন একজন করে 'কোরো', সবাই মিলে 'কোরো না'! এই কারণ, এই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী, 'সেকুলাররা' ইতর, অমানুষ, বেজন্মা, দুটো পয়সার জন্য নিজের মাকে বেচে দিতে পারে, বাংলাদেশের মোল্লাদের অনুগ্রহের জন্য নির্জলা মিথ্যা লিখতে পারে। এইরকম ধ্বজাধারীদের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু তার মধ্যে একটি 'উজ্জ্বল' উদাহরণ পশ্চিমবাংলার নামী সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি শেখের পদাঘাত খেয়ে পূর্ববাংলার মাদারিপুর থেকে প্রাণ নিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসেন সপরিবারে। এখন পূর্ববঙ্গের হিন্দুহন্তারক এবং হিন্দুনারীধর্ষকদের হয়ে সাফাই গাইতে তিনি একজন অগ্রণী।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে এই ধরনের ম্যাদামারা বক্তব্যের ফলে উগ্রপন্থীদের কাছে কী বার্তা যাচ্ছে? 'সেকুলারবাদ' বলে যে মুসলিম তোষণ দেশজুড়ে এই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো চালাচ্ছে, ইসলামী উগ্রপন্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিণাম কী? এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুদের পরিণাম কী?

উগ্রপন্থীদের কাছে বা তাদের সরবরাহকারী ও মদতদাতা পাকিস্তান সরকার, বিশেষ করে আই. এস. আই-এর কাছে এই বার্তাই যাচ্ছে, যে এই সরকার সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে চটাবার ভয়ে উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে কোনো কড়া ব্যবস্থা নেওয়া দূরের কথা, চড়া আওয়াজ পর্যন্ত করবে না। যদি করে, তবে হাঁ হাঁ করে উঠবে এইসব 'সেকুলার' লেপতোষকের দল। এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুর পক্ষে এর পরিণাম বুঝতে হলে একটু তলিয়ে ভাবতে হবে।

গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে যে বাম-কংগ্রেসী-'সেকুলার' চাট বাঙালি হিন্দুকে খাওয়ানো হয়েছে তাতে বাঙালি হিন্দু ইসলামী অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোর গলায় কিছু বলার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে। এমন একটা মানসিকতা তৈরি করে দেবার চেষ্টা হয়েছে যে মুসলমানের বিরুদ্ধে কিছু বলা মহাপাপ, বললে সমাজে পতিত হতে হবে, 'সাম্প্রদায়িক' নাম কিনতে হবে। এরই সুযোগ নিয়ে কয়েক কোটি বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ভারতে ঢুকেছে, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর ঘরে জন্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মুসলিমের ঘরে প্রচণ্ড গতিতে প্রজনন চলেছে। ১৯৪৭ সালে যখন দেশ পূর্ববঙ্গ -পশ্চিমবঙ্গে ভাগ হয়েছিল তখন হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি পূর্বপাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এই প্রজনন ও অনুপ্রবেশের ঠেলায় পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলা মুসলিমপ্রধান হয়ে গেছে—মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুর। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়। বাংলাদেশ সীমান্ত-সংলগ্ন বিহারে তিনটি জেলা—কিশানগঞ্জ, আরারিয়া ও কাটিহার এবং অসমে সাতটি জেলা—ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বরপেটা, নগাঁও, মোরিগাঁও, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ মুসলিমপ্রধান হয়ে গেছে। বিশেষ করে সীমান্ত বরাবর গ্রামগুলি মুসলিমপ্রধান হয়ে যাবার ফলে, বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসবাদী ও আই.এস.আই. এজেন্টদের ভারতে ঢুকে ভারতীয় সেজে যাবার খুব সুবিধা হয়েছে।

পত্রপত্রিকায় তো এসবের বিরুদ্ধে নামেমাত্র ছাড়া প্রতিবাদ নেই, উল্টে সেই গুজরাত নিয়ে পুরানো গান এখনো চলছে। গুজরাতে কী হয়েছিল? সাতষট্টি জন নিরীহ, নিরপরাধ, হিন্দু তীর্থযাত্রীকে মুসলমান গুণ্ডারা রাসায়নিক ঢেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল, এই হয়েছিল। তার প্রতিবাদে স্বাভাবিকভাবেই গুজরাতের হিন্দু জনসাধারণ ক্রোধে ফেটে পড়েছিল—পড়বেই, শরীরে মানুষের রক্ত থাকলেই পড়বে। এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব, কিন্তু তা সত্ত্বেও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী এই স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ দমন করেছিলেন। এর পরে যখন অক্ষরধাম মন্দিরে উগ্রপন্থী হামলা হয় তখন নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল, কোনো দাঙ্গা হতে দেয়নি। যাই হোক্ গোধরার ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে দাঙ্গা হয়েছিল তাতে আনুমানিক ১২০০ মুসলমান এবং ৩০০ হিন্দু মারা যায়।

গুজরাতে এই হয়েছিল। কিন্তু কী হয়নি? কোনো মুসলমান ঘর ছেড়ে পরবাসী হয়নি, যা পূর্ববঙ্গের এক কোটি হিন্দু হয়েছিল, কাশ্মীর উপত্যকার সাড়ে তিন লক্ষ হিন্দু হয়েছিল। এক কুতুবুদ্দিন দর্জি, যাকে নিয়ে কলকাতার কাগজে উচ্ছ্বাসের অন্ত ছিল না, সেও যথাসময়েই গুজরাতে ফেরৎ চলে গেছে।

এসব সত্ত্বেও মিথ্যাবাদীদের প্রচার বন্ধ হয়নি। পরম 'সেকুলার' লালু যাদব নিজের পছন্দমত একজনকে দিয়ে অনুসন্ধান করিয়েছিল। সেই অনুসন্ধানের ফল এমন হাস্যকর হয়েছিল যে লালু পর্যন্ত তা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেনি।

এসবের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের উগ্রপন্থাজনিত পরিস্থিতি আপাতদৃষ্টিতে ভাল মনে হয়। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বিস্ফোরণ এবং কলকাতার মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের বাইরে গুলিচালনা ছাড়া উগ্রপন্থী কোনো কার্যকলাপ পশ্চিমবঙ্গে তেমন হয়নি। কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয়নি। এ থেকে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে বাকি ভারত থেকে পৃথক, ইসলামী উগ্রপন্থার ব্যাপারে আমাদের তেমন দুশ্চিন্তার কিছু নেই?

দুঃখের বিষয় ব্যাপার এত সরল নয়, অনেকটাই জটিল। তার মূল কারণ, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ পুলিশের মতো চলে না, চলে সি. পি. এম-এর অঙ্গুলিহেলনে। সি পি এম-এর নীতি—ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের না ধরা, মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের স্বচ্ছন্দে ভারতে ঢুকে বসবাস করতে দেওয়া। যেখানে এই রকম স্বর্গরাজ্য রয়েছে সেখানে সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাস করতে যাবে কেন? সন্ত্রাস অন্য জায়গায় করবে, পশ্চিমবঙ্গকে ভারতভূমির মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করবে। এবং কার্যত তাই-ই হয়েছে। কিছু আপাত-বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে এর স্পষ্টই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হঠাৎ একটি ঘোষণা করলেন যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মাদ্রাসাগুলিতে জাতীয়তাবিরোধী প্রচার হচ্ছে। এ নিয়ে খুব হৈ চৈ হল, পার্টির ভিতরে বুদ্ধদেববাবুকে তিরস্কার করা হল বলেও খবর পাওয়া গিয়েছিল। রাস্তায় মোল্লাদের মিছিল বের হল। দিন পনেরো বাদে বুদ্ধদেব বেমালুম অস্বীকার করলেন যে তিনি মাদ্রাসা নিয়ে এরকম কোনো কথা বলেছিলেন।

এই ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই, ওই বুদ্ধবাবুই আবার বললেন যে, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের "জনসংখ্যার চরিত্রই বদলে যাচ্ছে"—অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম অনুপাত হিন্দুর প্রতিকূলে যাচ্ছে।

২০০৫ সালের আগস্ট মাসে এবং ২০০৬ সালেরও ওই মাসেই, যথাক্রমে উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ থানার কসবা মহাসো গ্রামে এবং মালদা জেলার বামনগোলা থানার বকচর গ্রামে একাধিক মুসলিম ছেলে একটি হিন্দু মেয়েকে গণধর্ষণ করে খুন করে। দুটি অপরাধের চরিত্র প্রায় একরকম। দুটি ক্ষেত্রেই পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করে এই ঘটনা চেপে দেবার জন্য, নিদেনপক্ষে ধর্ষণের ব্যাপারটা চেপে দেবার জন্য। পরে জনমতের চাপে (যার পিছনে হিন্দুভাবাপন্ন একটি রাজনৈতিক দলের বিশাল ভূমিকা ছিল) পুলিশ আসামীদের ধরে। সুখের বিষয়, দায়রা আদালতের বিচারে হেমতাবাদের চার খুনীদের মধ্যে তিনজনের যাবজ্জীবন এবং বকচরের খুনীর ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা দেশভাগের সময় থেকেই মুসলিমপ্রধান ছিল, পরে মুসলিমের অনুপাত আরো বাড়ে। বর্তমানে এই জেলার যে অধিকাংশ ভাগীরথীর পূর্বদিকে অবস্থিত সেই অংশে হিন্দুদের বাস করা, বিশেষ করে হিন্দু মেয়েদের থাকা, উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠছে। এই অঞ্চলে বৈষ্ণবদের বাস এবং তাঁদের ধর্মাচরণের অন্যতম অঙ্গ নগর

সংকীর্তন। এই নগর সংকীর্তনে বাধা দেওয়া এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০০২ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি নদিয়ার ধানতলায় হিন্দু বরযাত্রী মহিলাদের মাদ্রাসায় নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের জন্য অশনিসংকেত।

এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে অবিলম্বে পশ্চিমবাংলার বাংলাদেশ-সংলগ্ন মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে স্বাধীনতা বা বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্তির দাবী উঠবে এবং সেই দাবীর সপক্ষে হিন্দুবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আরম্ভ হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বাসঘাতক দুর্বুদ্ধিজীবীরা সেই ঢাকে কাঠি দেবে এবং কালক্রমে কাশ্মীর উপত্যকার মতো এইসব অঞ্চল থেকে হিন্দুদের উৎখাত হতে হবে।

আজকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর অবস্থা ভয়াবহ থেকে ভয়াবহতর হচ্ছে। রাজ্যে মসজিদের সংখ্যা হঠাৎ জ্যামিতিক হারে বাড়তে আরম্ভ করেছে। হাওড়ার বাঁকড়ায়, কলকাতার রাজাবাজারে, মুর্শিদাবাদের উমরপুরে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সারবেড়িয়ায় এমন এক একটা মসজিদ তৈরি হয়েছে যার মূল্য পাঁচ থেকে দশ কোটি টাকার কম হবে না। হতদরিদ্র মুসলিম পাড়ায় এইরকম মসজিদ হবার টাকা আসছে কোথা থেকে? আসছে সৌদি আরব থেকে, বাংলাদেশ মারফৎ। টাকার সঙ্গে আর কী আসছে? আসছে সন্ত্রাসবাদী, আসছে জাল নোট, আসছে আই. এস. আই. এজেন্ট। টাকা, মসজিদ বানানোর কাজ ছাড়া আর কোথায় যাচ্ছে? যদি বলি 'সেকুলার' রাজনীতিকদের পকেটে যাচ্ছে, আর তাদের সমর্থক সাংবাদিকদের পকেটে যাচ্ছে, অবাক হওয়ার খুব কারণ থাকবে কী?

যে সমস্ত অঞ্চলে হিন্দুপ্রাধান্য কমছে সেসব অঞ্চলে হিন্দুর, বিশেষ করে হিন্দুর মেয়েদের থাকা উত্তরোত্তর কঠিন হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া, রানীনগর, জলঙ্গী, ভগবানগোলা, নদীয়ার করিমপুর, ধানতলা, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর, ভূতনী, উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার, দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্তি, মগরাহাট, ভাঙড় প্রভৃতি জায়গায় এর মধ্যেই এই অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে। আস্তে আস্তে পুরো পশ্চিমবঙ্গে এই অবস্থা ছড়াবে—যদি এখনি সাবধান না হই।

সর্বনাশ সমাগত। যে চৌদ্দপুরুষের ভিটে ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, সিলেট, তা আজ অন্যের দেশ, বিদেশ। এবারে কি নদীয়া মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুব, দক্ষিণ ২৪ পরগণার পালা? এরপর ঘরপোড়া বাঙালি হিন্দু কি এখনো সাবধান হবে না?

*****